পেপটিক আলসার ৩
শিশুর খাদ্যে চর্বি ৪
নারী ও শিশু পাচার ৫
নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ৮

ISSN 1021-2078

# স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ১০ সংখ্যা ৩

চৈত্র ১৪০৮

## গর্ভপাত

সুলতানা ইয়াসমীন

গর্ভপাত বলতে সাধারণ গর্ভাবস্থায় আটাশ সপ্তাহের আগেই গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বুঝায়। গর্ভপাত দুইভাবে হতে পারে: (ক) স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত উপায়ে গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা (খ) অস্বাভাবিক পন্থায় অর্থাৎ জোরপূর্বক গর্ভের সন্তান নষ্ট করা বা গর্ভপাত ঘটানো যেতে পারে।

### স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত

স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে, যথা (১) সাঙ্কেতিক গর্ভপাত যেসব ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সংকেত বা আশঙ্কা দেখা দেয়, অথচ পরবর্তী পর্যায়ে গর্ভপাত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে; (২) অবশ্যম্ভাবী গর্ভপাত যে-গর্ভপাত কোনো অবস্থাতেই প্রতিরোধ করতে পারা যায় না; (৩) অসম্পূর্ণ গর্ভপাত যেক্ষেত্রে গর্ভধারণের ফসলের কিছু অংশ যোনিপথে বের হয়ে যায় এবং কিছু অংশ জরায়ুর ভিতরে থেকে যায়; (৪) সম্পূর্ণ গর্ভপাত যেক্ষেত্রে গর্ভের সন্তান পুরোপুরিভাবে যোনিপথে বের হয়ে যায় এবং (৫) সংক্রমণশীল গর্ভপাত যেক্ষেত্রে কোনো জীবাণু দ্বারা গর্ভতন্ত্র সংক্রামিত হয়ে থাকে। সাধারণত অসম্পূর্ণ গর্ভপাত এবং জোরপূর্বক ঘটানো গর্ভপাতের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণের মাত্রা বেশি থাকে। এই সংক্রমণ অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ এবং আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ।

### কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক পন্থায় জোরপূর্বক ঘটানো গর্ভপাত

গর্ভধারণ যখন কোনো মায়ের এবং সন্তানের স্বাস্থ্য এবং জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত ঘটানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ গর্ভধারণের পর এধরনের গর্ভপাত ঘটানো হয়। জোরপূর্বক ঘটানো গর্ভপাতে মাতৃমৃত্যুর হার অনেক অনেক গুণ বেশি।

### গর্ভপাতের কারণ ও ঝুঁকিসমূহ

কখনো কখনো গর্ভের সন্তানের ক্রটির কারণে (৬০%), আবার কখনো গর্ভবতী মহিলার অসুস্থতার কারণে (১৫%) স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত ঘটে থাকে। তবে গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে গর্ভের সন্তানের জটিলতার বা অসুস্থতার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটে এবং গর্ভাবস্থার শেষের দিকে সাধারণত মায়ের অর্থাৎ জরায়ুর সমস্যার কারণে গর্ভপাত বেশি হয়ে থাকে।

গর্ভাবস্থার ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে যেসব গর্ভপাত হয় তার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ হয়ে থাকে বাচ্চার অঙ্গহানির কারণে। এই অঙ্গহানি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন: মায়ের রুবেলা (জার্মান মিজেলস) সংক্রমণ ঘটলে, মা সাইটোটক্সিক ড্রাগ (মেথোট্রেক্সেট, সাইক্লো-ফসফামাইড, ভিনক্রিস্টিন, ইত্যাদি) সেবন করলে কিংবা মায়ের জন্মগত ক্রটির কারণে। গর্ভপাতের শতকরা ২৫ ভাগ ঘটে থাকে ক্রোমোজোমের ক্রটির কারণে।

অ্যাম্বিলিকেল কর্ড বা নাড়ীতে গিঁট পড়লে কিংবা নাড়ী পেঁচিয়ে গেলে বাচ্চার শরীরে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং সে গর্ভেই মারা যায় এবং গর্ভপাত ঘটে। এছাড়াও জমজ বাচ্চা, হাইড্যামনিওস, জরায়ুর টিউমার (ফাইব্রয়েড), ইত্যাদির ক্ষেত্রে জরায়ু আকারে খুব বেড়ে যায় এবং জরায়ুর মাংসপেশীতে টান লাগে, তাই গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যেসব মায়ের শরীরে ভিটামিন বি, ফলিক এসিড এবং প্রোটিনের অভাব থাকে তাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশি। এজন্য ধারণা করা হয়: অধিক সন্তানের জননী এবং গরীব শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত বেশি হয়ে থাকে। মায়ের কিডনীতে সংক্রমণ ঘটলে, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে এবং প্লাসেন্টা (গর্ভফুল) আগেভাগেই জরায়ুর গা থেকে আলাদা হয়ে গেলে (প্লাসেন্টা জরায়ুর সঙ্গে সঠিক স্থানে সংযুক্ত না হয়ে অন্য কোনো স্থানে সংযুক্ত থাকলে) গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। প্লাসেন্টাতে সংক্রমণ ঘটলে বা টিউমার হলে তা আগেভাগেই জরায়ুর গা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মায়ের শরীরে অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক হলে, শ্বাসতন্ত্রে মারাত্মক রক্তশূন্যতা থাকলে বাচ্চার শরীরেও অক্সিজেন-স্বল্পতা ঘটে এবং গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশসমূহে (যেমন আফ্রিকায়) বক্রকৃমি বা হুক-ওয়ার্মের জন্য মায়েদের রক্তশূন্যতা বেশি দেখা দেয় এবং এদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতও বেশি হয়। কিছু কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যেমন সীসা, এন্ড্রিন, আর্সেনিকের সংস্পর্শে আসলে এবং সাইটোটক্সিক ড্রাগ সেবন করলেও গর্ভপাত ঘটতে পারে। সেজন্য গর্ভাবস্থায়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে (প্রথম তিন মাস) সাইটোটক্সিক ড্রাগ সেবন করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালীতে যে প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

# স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

| | |
|---|---|
| *প্রধান উপদেষ্টা* | ডেভিড এ. স্যাক |
| *প্রধান সম্পাদক* | ফকির আঞ্জুমান আরা |
| *ব্যবস্থাপনা সম্পাদক* | এম. শামসুল ইসলাম খান |
| *সম্পাদক* | এম.এ. রহীম |
| *সদস্য* | ইউসুফ হাসান |
| | হাফিজুর রহমান চৌধুরী |
| | হাসান আশরাফ |
| | সিরাজুল ইসলাম |
| | তামান্না শারমীন |
| *মাস্ট হেড ডিজাইন* | আসেম আনসারী |
| *ডেস্কটপ প্রসেসিং ও প্রকাশনা* | তালুত সোলায়মান |
| *কম্পোজ* | হামিদা আক্তার |

*প্রকাশক*
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০)
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২ ২৪৬৭, ৮৮১ ৭৫১-৬০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮২ ৩১১৬ ও ৮৮২ ৬০৫০
ইমেইল: msik@icddrb.org

*মুদ্রণ*
সেবা প্রিন্টিং প্রেস
সি বি ১১০, মহাখালী রেলগেট
ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

গর্ভবতী মায়েদের মারাত্মক সংক্রমণ দেখা দিলে গর্ভপাত হতে পারে, তবে সব ধরনের সংক্রমণে নয়, কারণ সব ধরনের রোগজীবাণু প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল অতিক্রম করতে পারে না। মায়ের গুটিবসন্ত, রুবেলা (জার্মান মিজেলস) বা সিফিলিস হলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে। মায়ের খুব বেশি জ্বর হলে বাচ্চা অনেক সময় এত বেশি তাপ সহ্য করতে পারে না এবং গর্ভপাত ঘটে। কখনো কখনো মায়ের হরমোনজনিত রোগ, যেমন হাইপারথাইরয়-ডিজম (শরীরে থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য), হাইপোথাইরয়ডিজম (শরীরে থাইরয়েড হরমোনের স্বল্পতা), ডায়াবেটিস মেলাইটিস, ইত্যাদির কারণে গর্ভপাত হয়ে থাকে।

গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটে খুব জোরে আঘাত করলে বা মা দূর্ঘটনাক্রমে মাটিতে পড়ে গেলে গর্ভপাত ঘটতে পারে। পিতার ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ বীর্য বা শুক্রাণুর জন্য গর্ভপাত ঘটতে পারে। তবে এটা এখনো পুরোপুরি প্রমাণিত নয়।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও গর্ভপাতের শতকরা ২৫ ভাগ কারণ এখনো জানা যায় নি।

## গর্ভপাতের উপসর্গ

গর্ভপাতের উপসর্গ প্রকারভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত উপসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়:

- ❑ *মাসিক বন্ধ থাকা*: গর্ভপাতের পর দীর্ঘদিন মাসিক বন্ধ থাকতে পারে।
- ❑ *যোনিপথে রক্ত প্রবাহিত হওয়া*: রক্তপ্রবাহের মাত্রা বিভিন্ন ধরনের গর্ভপাতে বিভিন্ন রকম হতে পারে। বর্ণিত পাঁচ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাতের প্রথমটির ক্ষেত্রে সাধারণত কম রক্ত প্রবাহিত হয়। অবশ্যম্ভাবী গর্ভপাতের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি এবং অসম্পূর্ণ গর্ভপাতের ক্ষেত্রে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়। সম্পূর্ণ গর্ভপাতের ক্ষেত্রে যোনিপথে রক্ত ও মাছের পিন্ডির চাকার মত পদার্থ বের হয়।
- ❑ *তলপেটে ব্যথা*: ব্যথার তীব্রতা বিভিন্ন ধরনের গর্ভপাতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কখনো কখনো রোগী কোমড়-ব্যথা অনুভব করে
- ❑ *জ্বর*: সংক্রমণশীল গর্ভপাতে সাধারণত রোগীর জ্বর থাকে

উপরোক্ত উপসর্গের সঙ্গে নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখা দিতে পারে:

- যদি অতিরিক্ত ক্ষরণ হয় তবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়
- সংক্রমণশীল গর্ভপাতের ক্ষেত্রে নাড়ির গতি প্রতিমিনিটে ১০০-১২০ বা তার উপরেও উঠতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে এই গতি খুব দুর্বল হয়ে যায় এবং অনেক সময় অনুভব করা যায় না
- জরায়ুর আকার কখনো কখনো বড় থাকে (যেমন অসম্পূর্ণ গর্ভপাতে), আবার কখনো স্বাভাবিক থাকে (যেমন সম্পূর্ণ গর্ভপাতে)
- যোনিপথে রক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত রস নি:সৃত হয়
- জরায়ুর মুখ (সারভিক্স) কখনো খোলা থাকে (যেমন অসম্পূর্ণ গর্ভপাতে), আবার কখনো বন্ধ থাকে (যেমন সম্পূর্ণ গর্ভপাতে)

## রোগ নির্ণয়

উপসর্গ ও লক্ষণ থেকে কোন প্রকারের গর্ভপাত ঘটেছে সে-সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ধারণা পাওয়া যায়। তবে রোগীর সঠিক চিকিৎসা ও রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিচে উল্লেখিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়:

*রুটিন বা নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা*: রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা এবং রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়, কারণ অনেক সময় রক্তশূন্যতার কারণে রোগীর শরীরে রক্ত দেওয়ার দরকার হয়। গর্ভধারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয়।

যেসব মায়ের শরীরে ভিটামিন বি, ফলিক এসিড এবং প্রোটিনের অভাব থাকে তাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশি। এজন্য ধারণা করা হয়: অধিক সন্তানের জননী এবং গরীব শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত বেশি হয়ে থাকে। মায়ের কিডনীতে সংক্রমণ ঘটলে, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে এবং প্লাসেন্টা (গর্ভফুল) আগেভাগেই জরায়ুর গা থেকে আলাদা হয়ে গেলে (প্লাসেন্টা জরায়ুর সঙ্গে সঠিক স্থানে সংযুক্ত না হয়ে অন্য কোনো স্থানে সংযুক্ত থাকলে) গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়...

*বিশেষ পরীক্ষা:* আলট্রাসোনোগ্রাম-এর মাধ্যমে গর্ভপাতের প্রকারভেদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

### চিকিৎসা

ডাইলেটেশন এ্যান্ড কিউরেটেজ (ডিএন্ডসি) নামের একটি পদ্ধতিতে গর্ভ পরিষ্কার করার মাধ্যমে গর্ভপাতজনিত জটিলতার চিকিৎসা করা যায়। তবে সব ধরনের গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ডিএন্ডসি করা হয় না, যেমন সাঙ্কেতিক বা সংকেতদানকারী সম্ভাব্য গর্ভপাতের ক্ষেত্রে কখনোই ডিএন্ডসি করা যাবে না। রোগীর উপসর্গ ও লক্ষণ অনুযায়ী যেসব ঔষধ দেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে:

- ❑ প্যারাসিটামল (যদি জ্বর থাকে)
- ❑ অ্যান্টিবায়োটিকস (যদি সংক্রমণ থাকে)
- ❑ বুটাপেন (যদি পেটে ব্যথা থাকে)
- ❑ সিডাকসিন
- ❑ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রোগী যদি অজ্ঞান বা অতি কাতর অবস্থায় থাকে তবে শিরায় ইনজেকশন ও রক্ত দেওয়া হয়

### উপদেশ ও করণীয়

- গর্ভপাতের উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে আসা
- সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা
- সহবাস না করা
- প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জি, পানি, ফলমূল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা
- যাদের একবার গর্ভপাতের ইতিহাস থাকে পরবর্তী কালে তাদের গর্ভপাতের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাই তাদেরকে গর্ভধারণের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এবং গর্ভকালীন নিয়ম-কানুন পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে হবে

### গর্ভপাতের বিপদসমূহ

পৃথিবীর সকল দেশেই মাতৃমৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ গর্ভপাত। গর্ভপাতে মৃত্যু হয়ে থাকে সাধারণত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং সংক্রমণের জন্য। কখনো কখনো জরায়ু ফেটে যেতে পারে বা জরায়ুর মুখ (সারভিক্স) ছিঁড়ে যেতে পারে।

গর্ভপাতের ফলে মায়ের মৃত্যু না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়ের শরীর এত খারাপ হয়ে যায় যে, মা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছে।

## জেনে রাখা ভালো

# পেপটিক আলসার রোগ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

মতিউর রহমান

আলসার অর্থ ক্ষত। গলবিলের শেষ প্রান্তে, পাকস্থলীতে, ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের শুরুতে, পাকস্থলীর অপারেশনের পর পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থলে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ প্রান্তে যে ক্ষত হয় তাকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় পেপটিক আলসার বলে। পেপটিক আলসার একটি অতি পরিচিত রোগ। আপাতদৃষ্টিতে এটি কোনো মারাত্মক রোগ মনে না হলেও অবহেলার কারণে তা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এ-রোগে মৃত্যুর হার যদিও কম, ভোগান্তি অনেক বেশি। পেপটিক আলসার রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল "সেরে যাওয়া এবং পুনরাক্রমণ।"

হেলিকোব্যাকটার পাইলোরী নামক একধরনের ব্যাকটেরিয়া এই রোগের প্রধান কারণ বলে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত পেপটিক আলসার রোগের চিকিৎসা কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও বেশ কার্যকর। উন্নত বিশ্বে এ-রোগের প্রকোপ কমলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে তা বাড়ছে। স্বাস্থ্যসচেতন ও নিয়মতান্ত্রিক হলে এবং সুচিকিৎসা করলে এ-রোগ ভালো হয়।

### পেপটিক আলসার কাদের বেশি হয়?

১. যাদের পরিবারে কারও এই রোগ আছে (এক্ষেত্রে রোগ হবার সম্ভাবনা প্রায় ৩ গুণ বেশি)
২. মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের বেশি হয় (প্রায় ৫ গুণ বেশি)
৩. যাদের রক্তের গ্রুপ 'ও'
৪. যারা বাতের ব্যথার ঔষধ প্রায়শই গ্রহণ করেন
৫. যারা ধুমপান করেন
৬. যাদের পাকস্থলীতে হেলিকোব্যাকটার পাইলোরী নামক জীবাণু আছে

### পেপটিক আলসার-এ আক্রান্ত রোগীদের পালনীয়

*যা যা করবেন*

১. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করুন
২. দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলুন
৩. সবসময় হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করুন
৪. জীবনের সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করুন
৫. পায়খানার রং আলকাতরার মত কালো হলে বা রক্ত বমি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে জানান
৬. অন্য কোনো রোগের জন্য পরামর্শ গ্রহণের সময় আপনার পেপটিক আলসার রোগের কথা চিকিৎসককে জানান

*যা যা করবেন না*

১. খাবার পরপরই বিছানায় শুয়ে পড়বেন না, তবে ২ ঘণ্টা পর শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই; যাদের বুক জ্বালা করে, তাদের খাবার গ্রহণের পরপরই উবুড় হয়ে কোনো কাজ করা উচিত নয়
২. অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবেন না
৩. চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ঔষধ বন্ধ করবেন না
৪. নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না

*যা যা খাবেন*

- ❑ নিয়মিত ও পরিমিত খাবার খাবেন অর্থাৎ সময়মত খাবেন, কিন্তু পেটভরে খাবেন না (পেটের কিছু অংশ খালি রাখা উচিত)
- ❑ স্বাভাবিক খাবার খাবেন, তবে সহজপাচ্য খাবার খাওয়া ভালো
- ❑ খাবার ভালো করে চিবিয়ে খাবেন এবং আস্তে আস্তে খাবেন
- ❑ সারাদিনের খাবার ৫ বারে খাবেন, যেমন (ক) সকাল ৭টা থেকে ৮টায়, (খ) সকাল ১১টায়, (গ) দুপুর ১টা থেকে ২টায়, (গ) বিকেল ৫টা থেকে ৬টায়, এবং (ঙ) রাত্রি ৮টা থেকে ৯টায়

*যা যা খাবেন না*

- তাড়াহুড়া করে কিছু খাবেন না
- বেশি ঝাল, ভাজা, ভূনা খাবার না-খাওয়া ভালো
- যেসব খাবার আপনার ক্ষতি করে বলে মনে হয় তেমন খাবার খাওয়া উচিত নয়
- বেশি গরম অবস্থায় যেকোনো খাবার, এমনকি চা, কফি, দুধ, ইত্যাদি খাবেন না
- বিড়ি-সিগারেট, তামাক-পাতা, জর্দা, গুল, মাদকদ্রব্য সেবন নিষেধ
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যথা-উপশমকারী, বিশেষ করে বাতের ব্যথার ঔষধ খাবেন না
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অন্য কোনো ঔষধও খাবেন না

# শিশুর খাদ্যে চর্বির ভূমিকা

আনোয়ারা হায়দার

সাম্প্রতিক কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশে অপুষ্টির মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। পাঁচ বছরের কম-বয়সী ৫৮% শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চাইতে কম এবং ৫১% ঠিকমত বাড়তে পারে না। বাংলাদেশের এই অপুষ্টিজনিত সমস্যায় মানুষের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জ্ঞানবুদ্ধি অর্জন ও শিক্ষালাভের ক্ষমতা কমে যায়–যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উন্নত দেশগুলোর মানুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে দেবে। বিষয়টি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

শিশুর খাদ্যে চর্বি বা তেলজাতীয় উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টিও একটি বিরাট সমস্যা–যা দূর করা খুব সহজ। শিশুর খাদ্যে চর্বির পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিলেই এই সমস্যা দূর করা যায়। শিশুর খাদ্যে চর্বির ভূমিকা আলোচনা করার আগে চর্বি কী তা আমাদের জানতে হবে।

চর্বি হচ্ছে আমাদের প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর একটি। এর উৎস হচ্ছে তেল, ঘি, মাখন, ইত্যাদি। এগুলো ঘনীভূত শক্তির উৎস। ১ গ্রাম আমিষ দেয় ৪ ক্যালরি, ১ গ্রাম শর্করা দেয় ৪ ক্যালরি, আর ১ গ্রাম চর্বি দেয় ৯ ক্যালরি--অর্থাৎ আমিষ ও শর্করার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। আমাদের খাদ্যে যখন সবকয়টি উপাদানই সঠিক পরিমাণে থাকে তখন তাকে বলা হয় সুষম খাদ্য। সাধারণত আমাদের খাদ্যে ক্যালরির শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ শর্করা থেকে, ১০-১৫ ভাগ আমিষ থেকে এবং ২৫-৩৫ ভাগ চর্বি থেকে আসলে ভালো হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য খাদ্যের দরকার হয় তার শক্তির জন্য এবং শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, কিন্তু একজন শিশুর খাদ্যের প্রয়োজন শক্তির জন্য, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং শরীর বর্ধনের জন্যও। শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অত্যধিক। আমিষজাতীয় খাদ্যের উৎস হচ্ছে: দুধ, ডিম, মাছ, মাংস এবং সব ধরনের বীজজাতীয় খাদ্য। কিন্তু এজাতীয় খাদ্যের দাম অনেক বেশি। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নবিত্তেরও নিচে। প্রতিবারের খাবারে যদি শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের সমাবেশ থাকে, তাহলে উক্ত খাবারে অল্প পরিমাণ আমিষ থাকলেও সেই আমিষ শরীর গঠনে ভূমিকা রাখে। আর শিশুর খাদ্যে তেল দিলে অনেক শক্তি জোগায়; তদুপরি আমিষও যথাযথভাবে কাজ করে। অন্যথায় আমিষজাতীয় খাদ্য শরীরে শক্তি জোগায় বটে, তবে দেহগঠন ও শরীরের ক্ষয়পূরণে কাজ করতে পারে না। আমিষের এই কাজটি অন্য খাদ্যোপাদান করতে পারে না। অতএব খাবারে যদি সঠিক পরিমাণে শর্করা (ভাত, রুটি, আলু, ইত্যাদি) ও চর্বি (তেল, ঘি, মাখন) থাকে তাহলে এগুলো শরীরে শক্তি জোগাবে আর আমিষ শরীরের রক্তমাংস ও হাড় তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

যেহেতু শিশুদের পেট ছোট, ওরা একবারে অনেক খাবার খেতে পারে না। অথচ ওদের শরীরের চাহিদা প্রচুর। কাজেই সেই পরিমাণ শক্তি যদি শর্করা থেকে আনতে হয় তাহলে অনেক খাবার দিতে হবে। অথচ এক্ষেত্রে অল্প তেল দিলেই প্রচুর শক্তি পাওয়া যাবে। তাছাড়া তেলের ভিতরে যে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড আছে–যেমন লিনোলিক এসিড এবং লিনোলেনিক এসিড, এরাচিডনিক এসিড–এগুলো যেমন শক্তি প্রদান করে, তেমনি শারীরিক ও মানসিক উন্নতি এবং সুন্দর ত্বকের জন্যও প্রয়োজন। লিনোলিক এসিডের অপর্যাপ্ততার কারণে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের উন্নতি, ত্বকের উন্নতি, চুলের স্বাভাবিকতা এবং অসুখে দ্রুত আরোগ্য লাভের ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন A, D, E, K এগুলোর পরিশোষণের জন্য চর্বি বা তেলজাতীয় খাদ্য অত্যাবশ্যকীয় যার অভাবে শিশুর রাতকানা, রিকেট, ইত্যাদি মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশের মায়েরা শিশুর বয়স ২/১ মাস পার না হতেই চালের 'লোতা' অথবা পাতলা করে গরুর দুধ দিয়ে থাকে। তাতে শিশু ধীরে ধীরে মারাত্মক অপুষ্টির শিকার হয়।

বাংলাদেশের মায়েদের উচিত শিশুকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করানো এবং প্রথম পাঁচ/ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এবং ছয় মাসের পর থেকে যখন শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়ানো হবে তখন তাতে তেল দিয়ে রান্না করা উচিত। শিশুদের জন্য সুজি রান্নাতেও তেল দিতে হবে। যখন বাচ্চাদের ভাত খাওয়ানো শুরু করা হবে তখন ১ মুঠ ভাত ভালো করে কচ্‌লিয়ে তার মধ্যে একটু তেল (১ চামচ) মেখে তারপর তাতে পরিবারের সবার জন্য রান্না-করা খাবার থেকেই একটু মাছ, ডালের ঘন অংশ (ডালের পানি নয়), একটু তরকারি মিশিয়ে খাওয়ালেই হবে। যে-মায়েরা খিচুড়ি রান্না করবেন তাঁরা যেন অবশ্যই খিচুড়িতে তেল দেন। তবে উপরোক্ত নিয়মে ভাত কচ্‌লিয়ে খাওয়ালে আর খিচুড়ি রান্নার প্রয়োজন পড়বে না, কারণ আমাদের গরীব মায়েদের জ্বালানীর অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় চর্বি-উপাদান যুক্ত করলে, শিশুদের খাদ্যে শক্তির ঘাটতি পূরণ হবে এবং শিশু সবল ও সুস্থভাবে গড়ে উঠবে।

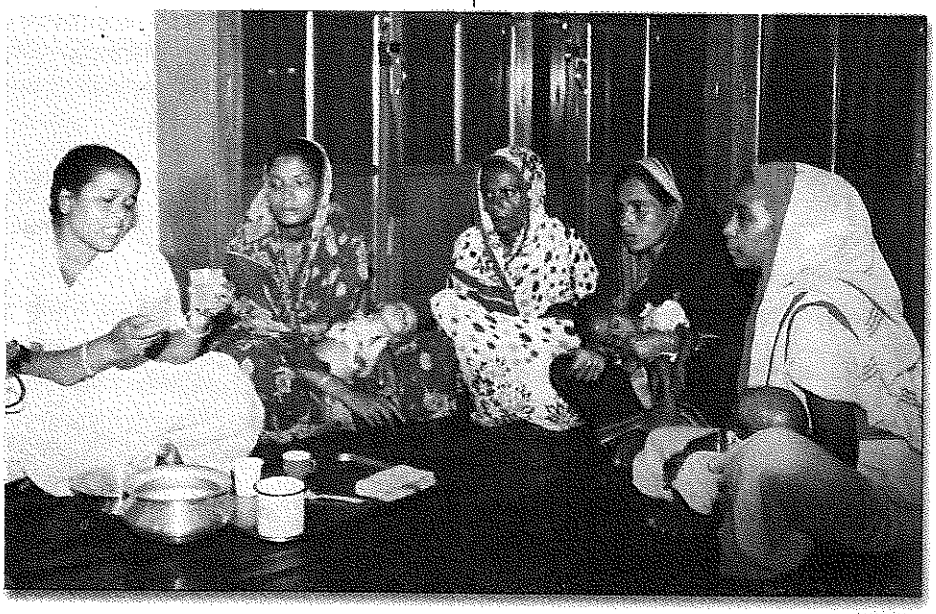

# নারী ও শিশু পাচার: বহুমুখী সঙ্কট

জিয়াউল হক চৌধুরী, রুখসানা গাজী

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশু পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ যেখান থেকে প্রতিনিয়ত শতশত নারী ও শিশু ভারত, পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাচার হচ্ছে। পাচার যেমন এক দেশ থেকে অন্য দেশে হতে পারে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলেও হয়ে থাকে। তবে সাধারণত অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশীয় পাচারের মধ্যে একটি সংযোগ থাকে অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যারা পাচার হয় তাদের একটি অংশই বিদেশে প্রেরিত হয়। অনেকে পাচারকে অভিবাসনের (migration) একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

পাচার শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে 'স্থানান্তর' যা দ্বারা এর সাথে জড়িত গর্হিত কর্মকান্ডের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায় না। অথচ পাচার নামক অপরাধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে যৌনদাসত্ব, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, বাধ্যতামূলক উটের দৌড়ে জকি হিসেবে অংশগ্রহণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের মত জঘণ্যতম কর্মকান্ড। একজন কিশোরী বা মহিলা যখন পাচার হয় তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জনের হাত বদল হতে হতে অবশেষে সে পতিতালয়ে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয় যেখানে তাকে নিয়োজিত করা হয় চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনমূলক কাজে। যদিও পাচারের স্বাস্থ্যগত ফলশ্রুতির ওপর বাংলাদেশে এযাবত উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয় নি, তবুও ধরে নেওয়া যায়, পাচারকৃত কিশোরী ও মহিলাদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, অস্বাস্থ্যকর উপায়ে গর্ভপাত, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, ইত্যাদির ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। আবার যখন পাচার হয়ে-যাওয়া মহিলা ও কিশোরীদের মধ্যে কেউ কেউ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন এদের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস-এর মত মারাত্মক যৌনব্যাধি এদেশে বিস্তৃতি লাভ করার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। পাচারের এসব বহুমূখী সঙ্কটের তাৎপর্য বিবেচনা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পাচারের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে বলা হয়: পাচার হলো নারী ও শিশু সংগ্রহ, কেনাবেচা, জোরপূর্বক দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বিদেশে স্থানান্তর, দমন-পীড়ন, হুমকি, অসদাচরণ, প্রতারণা এবং বিভিন্ন নির্যাতনমূলক কাজে তাদের নিয়োজিত করা, যেমন যৌনদাসত্ব, পতিতাবৃত্তি, বাধ্যতামূলক শ্রম বিক্রয়, ভিক্ষাবৃত্তি এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়।

সম্প্রতি আইসিডিডিআর,বি-এর ফ্যামিলি হেলথ রিসার্চ প্রকল্প নারী ও শিশু পাচার-সংক্রান্ত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো: বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচারের ব্যাপকতা, এর কারণ, গভীরতা, ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, পাচার কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি এবং পথসমূহ সম্পর্কে জানা। এই গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পাচার-সংক্রান্ত কী ধরনের কার্যক্রম চালু রয়েছে সে-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সর্বোপরি এ-বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা খুঁজে বের করা।

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এমন সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ছাড়াও উদ্ধারপ্রাপ্ত মহিলা ও শিশু এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে নারী ও শিশু পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, প্রকাশনা, সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পাচারের নিচে উল্লেখিত স্বাস্থ্যগত পরিণতি পরিলক্ষিত হয়:

পাচারের স্বাস্থ্যগত পরিণতি

- ❑ পাচারকৃত নারী ও শিশুরা নূন্যতম স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়
- ❑ শিশু পতিতাদের শতকরা ২০ ভাগ পরিণত বয়সে পৌছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করে
- ❑ শিশু পতিতাদের শতকরা ২২ ভাগ শারীরিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ও ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়
- ❑ ভাসমান শিশু পতিতাদের শতকরা ৮০ ভাগ প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়
- ❑ পাচারকৃত মেয়ে-শিশুরা পতিতালয়ে পৌছানোর প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই বিভিন্ন যৌনরোগের শিকার হয়

যদিও পাচার-সংক্রান্ত প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর, তবুও বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রায় ৫ লক্ষ বাংলাদেশী কিশোরী ভারতের এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন পতিতালয়ে কাজ করে--যাদের বেশিরভাগই পাচারের শিকার বলে ধারণা করা হয়। আসলে পাচারের অনুকূলে যেসব সামাজিক প্রেক্ষাপট সরাসরি প্রভাব ফেলে তার সবই বাংলাদেশে বিদ্যমান, যেমন জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের জন্য জনগণের শহরমুখিনতা, নগরায়ন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগ। একদিকে ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে গার্মেন্টিস শ্রমিক হিসেবে ব্যবহারের জন্য এবং গৃহস্থালী কাজে নারী-শিশুদের রয়েছে অত্যধিক চাহিদা, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মহিলা ও শিশুদের জন্য কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ না থাকায় তারা শহরাভিমুখী হয়ে পড়েছে এবং খুব সহজেই পাচারকারীদের শিকার হচ্ছে।

আমরা জানি, দূর্যোগকালীন সময়ে কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা আরেকটি বিরাট সমস্যা। আমাদের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হয় না। আবার পাচারকারীরা বিনা যৌতুকে বিয়ের প্রলোভন দেখায়, তাই সহজেই বাবা-মা তাদের কন্যাদের বিয়ের নামে পাচারকারীদের কাছে প্রতারিত হয়। বৈধ কাগজ-পত্রের অভাবে এসব পাচার হয়ে-যাওয়া মহিলা বা শিশু স্বদেশে ফিরে আসতে পারে না; নূন্যতম স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় না। যারা শিশুবয়সে পাচারের শিকার হয়, তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নাম-ঠিকানা, এমনকি স্বদেশের ভাষা এবং রীতিনীতিও ভূলে যায়। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অনেক পরিবার রয়েছে যাদের সীমান্তের দুই পাশেই একই পরিবারের সদস্য বসবাস করছে। এসব পরিবারের আদান-প্রদানের মাধ্যমেও অনেক সময় পাচার ঘটে থাকে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অনেক ছোট ছোট এলাকা রয়েছে যেখানে দু'দেশের কোনোটির আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে এই এলাকাগুলো দিয়ে পাচারকারীরা

তাদের কাজটি সহজেই করতে পারে। গবেষণার ফলাফলে আরো দেখা গেছে, নারী ও শিশু পাচারের কারণগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে জড়িত—যা দু'টি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এর একটি হচ্ছে দেশের মধ্যে বিরাজমান এমন পরিস্থিতি যার ফলে মানুষ উন্নততর জীবন যাপনের জন্য স্থানান্তর বা অভিগমনের প্রয়োজন অনুভব করে, যেমন চাকুরির সীমিত সুযোগ, নারীর নীচু আর্থ-সামাজিক অবস্থান, নগরায়ন ও নগরমুখিনতা। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, কোনো অঞ্চল বা দেশে বিরাজমান এমন পরিস্থিতি যা অন্যান্য অঞ্চল বা দেশের মানুষকে আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ করে, যেমন মজুরি-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ, শ্রমিক অভিবাসনের অনুকূল পরিস্থিতি ও উন্নত জীবনযাত্রার প্রলোভন।

বিভিন্ন অভিনব পন্থায় দালালরা নদীবন্দর, বিভিন্ন বাস ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে নারী সংগ্রহ করে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে কর্মসংস্থানের আশায় আগত নারী, বিশেষত তালাকপ্রাপ্ত ও পরিত্যাক্তা নারী ও শিশুকে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে সংগ্রহ করার জন্য এরা ওঁৎ পেতে থাকে। পাচারের জন্য প্রধানত সীমান্ত এলাকার শহর ও গ্রাম থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করা হয়। যেসব কারণ পাচারের সাথে জড়িত তা হচ্ছে ভেঙে-যাওয়া সংসার, বৈধব্য, সচেতনতার অভাব, দারিদ্র্য, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব, সীমিত কর্মসংস্থান, যৌতুক, বিবাহের প্রচলিত রীতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্বল অবকাঠামো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাচারকারীদের সংঘবদ্ধ চক্র।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৮টি এলাকা দিয়ে বেশিরভাগ পাচারকার্য সংঘটিত হয়। এসব সীমান্ত এলাকাগুলোর বেশিরভাগ যশোর, সাতক্ষীরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সিলেট জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নঁওগা, চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী এবং দক্ষিণে যশোর ও সাতক্ষীরা হচ্ছে পাচারের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। কক্সবাজারের তিনটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকেও নারী ও শিশুদের সংগ্রহ করা হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য পাচারকারীরা মূলত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সীমান্ত এলাকা বেছে নেয়। তবে ভারতে প্রবেশের দু'টি প্রধান সীমান্তবর্তী এলাকা হলো যশোরের বেনাপোল এবং সাতক্ষীরা। এই দু'টি পথ দিয়ে মোট পাচারের শতকরা ৫০ ভাগ সংঘটিত হয়ে থাকে।

পাচার প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজের মধ্যে প্রধান হচ্ছে গবেষণা, উদ্ধার, পূনর্বাসন, সচেতনতা বৃদ্ধি, তদন্ত ও আইনগত সহায়তা প্রদান।

তবে উদ্ধার-পরবর্তী পরিস্থিতি প্রায়শই থেকে যায় সবার অজানা। সাধারণত উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিকভাবে নিয়ে যাওয়া হয় সরকারি কিংবা এনজিও আশ্রয় কেন্দ্রে। সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে এদের অনেকেই পুনরায় তাদের পরিবারে ফিরে যেতে চায় না বা পারে না। ফলে তাদের পুনরায় একই পরিস্থিতিতে ফিরে আসার আশঙ্কা থেকে যায়। আমাদের দেশে নারী পাচার প্রতিরোধে বিবিধ আইন, নীতিমালা ও কার্যাদেশ রয়েছে। তথাপি এটাও বিশদভাবে স্বীকৃত যে, এসব আইনের কার্যকর প্রয়োগে অনেক জটিলতা রয়েছে। নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও পাচার প্রতিরোধে জাতীয় নীতি-নির্ধারকদের আরো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

যদিও পাচার প্রতিরোধে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যোগাযোগ, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ সমন্বিত কার্যক্রমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পাচারের আঞ্চলিক গতি-প্রকৃতি, ফলশ্রুতি, উন্নয়নের ওপর এর প্রভাব, ইত্যাদি বিষয়ে আরো গবেষণা হাতে নেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে পাচার-সম্পর্কিত একটি কমিশন গঠনের পাশাপাশি পাচারের দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক টিম গঠন ও তথ্য কেন্দ্র খোলার সমধিক প্রয়োজন রয়েছে—যা পাচার কার্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে সহায়তা করবে; আবার পাচারকারী যে-দেশেই ধরা পড়ুক না কেন তাকে সাজা দেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সর্বোপরি, দেশের সাধারণ মানুষকে পাচারের বিপক্ষে সচেতন করে তুলতে হবে। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, শিক্ষা-উপকরণ ও গণমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার। বিশেষত স্কুলের ছেলেমেয়েদের এ-বিষয়ে সচেতন করে তোলা জরুরী, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাচারকারীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে এসব কিশোর-কিশোরী।

## স্বাস্থ্য কুইজ ৩১

১. টিটি টিকার ৫টি ডোজ কখন দিতে হয়?

২. বয়ঃসন্ধিকাল কোন বয়সে শুরু এবং কোন বয়সে শেষ হয়?

৩. স্বপ্নদোষ কি একটি রোগ? এটা কখন হয়?

৪. আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত ব্যক্তি/রোগী চেনার উপায় কী?

৫. আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত রোগী কি এই রোগ অন্যের দেহে ছড়াতে পারে? কিভাবে একজন সুস্থ মানুষ আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হতে পারে?

*প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের কাছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে*

## স্বাস্থ্য কুইজ ৩০-এর উত্তর

১. সিফিলিসে আক্রান্ত মায়ের নবজাতকের কনজাংটিভাইটিস (neonatal conjunctivitis) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে

২. ডেঙ্গু জ্বর ৩ রকমের হতে পারে:
- ক্লাসিক্যাল (Classical)
- হিমোরেজিক (Haemorrhagic)
- হিমোরেজিক ও শক (Haemorrhagic with shock)

৩. শিশু খুবই মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ছয়টি লক্ষণ (বিপদচিহ্ন) হচ্ছে:
- বুকের দুধ বা পানীয় গ্রহণ না-করা
- খিঁচুনি
- অস্বাভাবিক ঘুম-ঘুম ভাব
- শ্বাস নেবার সময় (শান্ত অবস্থায়) বাধাগ্রস্থ হবার শব্দ
- শ্বাসকষ্টের সাথে সাথে শরীর ও মুখমন্ডল নীল হয়ে-যাওয়া
- মারাত্মক পুষ্টিহীনতা

শিশুর কাশি, দ্রুতশ্বাস এবং বুক ডেবে-যাওয়া ছাড়াও উপরের লক্ষণগুলো খুবই মারাত্মক নিউমোনিয়ার লক্ষণ

৪. বাংলাদেশে প্রধান ৩টি সংক্রামক ব্যাধি হচ্ছে:
- ডায়রিয়া
- যক্ষা
- ম্যালেরিয়া

৫. ভিটামিন এ-র অভাবজনিত দু'টি রোগ হচ্ছে:
- রাতকানা (Nightblindness)
- জেরফথ্যালমিয়া (Xerophthalmia)

*সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন নি*

## নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন

৮-এর পাতার পর...

পেশাদার যৌনকর্মী, সচরাচর বিদেশ ভ্রমণকারী, এইডস-আক্রান্ত দেশে প্রবাসী, বিদেশী টুরিস্ট, অসামাজিক জীবনাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তি, দূরপাল্লার ট্রাক-ড্রাইভার, নাবিক/খালাসী এবং এসব ব্যক্তিদের স্বামী, স্ত্রী বা যৌনসঙ্গী। অন্যের দেহে পরিসঞ্চালনের জন্য এদের রক্ত নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ রক্তদাতা হচ্ছে: স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত দেহের অধিকারী, ধার্মিক, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুশৃঙ্খল এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাচারে অভ্যস্ত, সুশিক্ষিত, সমাজ-সচেতন ব্যক্তি, শিক্ষক, ছাত্র ও চাকুরিজীবী। তারা রক্তদানের জন্য সঠিক বলে বিবেচিত। যদিও কম ঝুঁকিপূর্ণ রক্তদাতা ও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের রক্ত মোটামুটি নিরাপদ তবুও সকল রক্তের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রক্ত পরিসঞ্চালন করা উচিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাধারণত ছয়টি রোগের পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে: এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস বি, সিফিলিস, হেপাটাইটিস সি, ম্যালেরিয়া এবং চ্যাগাস রোগ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক এবং যদি সম্ভবপর হয় শেষের তিনটিও করা ভালো; তবে আমাদের দেশে চ্যাগাস রোগ এখনও দেখা যায় নি। সংগৃহীত রক্তের পরীক্ষা যদি এসব রোগের জন্য পজিটিভ হয় তবে সেসব রক্ত বর্জন করতে হবে, আর নেগেটিভ হলে তা পরিসঞ্চালনের জন্য সঠিক বলে গণ্য হবে।

রক্ত পরিসঞ্চালনে সবসময়ই ঝুঁকি থাকে, কারণ তা অন্যের দেহ থেকে সংগৃহীত হয়। একদিকে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি, অন্যদিকে রয়েছে জটিল শারীরিক প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি। তাই রক্তের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে রক্ত পরিসঞ্চালন করা উচিত। যদি কৃমিজনিত রক্তশূন্যতা দেখা দেয় তাহলে ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন: লৌহ ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতায় লৌহজাতীয় ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষেত্রবিশেষে রক্তশূন্যতার মাত্রা বেশি হলে রক্ত বা তার উপাদান পরিসঞ্চালন করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রক্তের অপব্যবহার বন্ধ করে পরিসঞ্চালনজনিত জটিলতা প্রতিরোধ করা যায়। মনে রাখতে হবে, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনে লক্ষ লক্ষ প্রাণ যেমন বেঁচেছে, তেমনি দূষিত রক্ত গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিসঞ্চলনজনিত সংক্রমণ ও জটিলতায় ভুগেছে ও ভুগতে পারে। কাজেই এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিসসহ অন্যান্য সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে, রক্তের গুণগত মান ঠিক রাখতে এবং পরিসঞ্চালনজনিত অন্যান্য জটিলতা এড়াতে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের বিকল্প নেই।

# বাচ্চাদের কিভাবে শাসন করা উচিত: একটি সমীক্ষা

জেনা হামাদানী

আমরা সবাই চাই আমাদের বাচ্চাদের ব্যবহার ভালো হোক এবং তারা আদর্শবান হোক। কাজেই আমাদের জানা দরকার কাকে 'আদর্শ বাচ্চা' বলে বা কী কী গুণ থাকলে তাকে 'ভালো বাচ্চা' বলা যায়।

মা-বাবার কাছে তাদের শিশুর গুণ সম্পর্কে জানতে চাইলে নিচের উত্তরগুলো থেকে হয়তো তারা যেকোনো একটি বলতে পারেন:

● বাবা-মা'র কথা শোনে ● বড়দের কথা শোনে ● বড়দের সম্মান করে ● লেখাপড়ায় মনোযোগী ● খারাপ কথা বলে না বা গালি দেয় না ● কাউকে মারে না ● কারো সাথে ঝগড়া করে না ● ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে ● পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন তারা উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো কিভাবে বাচ্চাদেরকে শেখান, বাচ্চাদের কেমন করে শাসন করেন, বাচ্চা যদি কোনো খারাপ কাজ করে বা তাদের কথা না শোনে তাহলে তারা কী করেন। এর উত্তরে মা-বাবা বলতে পারেন:

● তাকে শাসন করি ● কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখাই বা আদব-কায়দা শেখাই ● কথা না শুনলে জোরে বকা দিই ● খারাপ কাজ করলে শাস্তি দিই ● দরকার হলে মারি

সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য আপনিও তখন নিচের কথাগুলো মা-বাবাকে বলতে পারেন:

● আদর করে ওদের বুঝাই কোনটা ভালো ও কোনটা খারাপ ● যখন বাচ্চাকে কোনো কিছু করতে বলি তখন মিষ্টি সুরে বলি ● বাচ্চা কোনো ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করি ● বাচ্চা যদি কোনো খারাপ কাজ করে তাহলে ওকে জিজ্ঞেস করি "তোমার এই কাজটা করা কি ভালো ছিলো? কোনটা করলে ভালো হতো?" ● বাচ্চাকে বলি "তুমি এরকম করলে মা-বাবা দুঃখ পাবে।"

বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া খুবই জরুরী। আমরা যদি ওদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিই তাহলে ওরা খারাপ কাজের মাধ্যমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। সেই জন্য আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যাতে ওদের প্রতি সবসময় যথেষ্ট মনোযোগ দিই, এমনকি আমরা যদি খুব ক্লান্ত বা ব্যস্ত থাকি তখনও। যদি দেখি বাচ্চা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোনো খারাপ কাজ করছে তখন তাকে অনেক আদর দিয়ে অন্য কোনো ভালো কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে।

বাচ্চার সত্যিকার কোনো সমস্যা বা কোনো অসুখ থাকতে পারে যার জন্য সে এরকম করছে। ওর সমস্যাটা কী সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁরা তাঁদের বাচ্চাদের কিভাবে শাস্তি দেয়। তাঁরা বলতে পারেন বাচ্চাদেরকে বকা দেন, গালি দেন, ভয় দেখান, খেতে দেন না, খেলতে দেন না, বাসা থেকে বাইরে যেতে দেন না, ইত্যাদি।

আসুন, আমরা ভেবে দেখি কোন অবস্থাতে আমরা বাচ্চাদেরকে বেশি শাস্তি দিই। মা-বাবাকে কিছুক্ষণ ভাবতে দিন। ওদের মতামত দেওয়ার পরে, আপনিও নিচের কয়েকটি উদাহারণ দিতে পারেন:

● আমি যখন খুব ক্লান্ত থাকি এবং বিশ্রাম নিতে চাই, তখন যদি আমার বাচ্চা এমন কিছুর জন্য আমাকে বিরক্ত করে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় ● আমি যখন অসুস্থ থাকি ● আমি যখন খুব ব্যস্ত থাকি ● আমি যখন যেকোনো কারণে রেগে থাকি ● আমরা স্বামী-স্ত্রী যখন একে অন্যের সাথে রাগ করি ● যখন অন্য কেউ আমার বাচ্চার কোনো কাজের জন্য নালিশ করে ● যখন কেউ আমাকে বলে, "বাচ্চাদের না মারলে, বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা সবাই একমত হতে পারি যে, সবক্ষেত্রে বাচ্চা কোনো ভুল করার জন্য আমরা তাকে শাস্তি দিই না। এমনও হতে পারে, আমরা অন্য কারণের জন্য নিজেকে ধরে রাখতে না পেরেও বাচ্চাকে মারি। চলুন ভেবে দেখি, আমরা যখন ছোট ছিলাম এবং কোনো খারাপ কাজ বা ভুলের জন্য শাস্তি পেয়েছি, কোন ধরনের শাস্তি আমাদের জন্য কার্যকর হয়েছিলো। যখন কোনো ভুলের জন্য আমাদেরকে বড়রা মেরেছিলো তখন আমাদের কেমন লেগেছিলো। মার খেয়েও কি আমরা আর কোনো খারাপ কাজ করি নি?

বাচ্চাকে মারলে বা গালি দিলে ওদের কেমন লাগে এ-বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন এবং তার কী ফলাফল হয়। মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন ওদের কী ধারণা। মা-বাবা বলার পরে আপনিও নিচের কথাগুলো বলতে পারেন:

● বাচ্চাকে মারলে তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায় ● বাচ্চাকে মারলে সে বেয়াদপ হয়ে যায় ● মা-বাবা এবং অন্যদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে ● বাচ্চাকে মারলে আত্মসম্মান হারিয়ে যায় এবং তারা সবসময় নিজেকে ছোট বোধ করে। সে-কারণে কোনো কাজ শুরু করলে শেষ করতে চেষ্টা করে না এবং কাজের মাঝখানে এসে তা ছেড়ে দেয় ● বাচ্চাকে মারলে তার লজ্জা-শরম থাকবে না; আস্তে আস্তে সাহস বাড়বে এবং এরপর তাকে আরো বেশি এবং জোরে মারতে হবে; তারপর এমন এক পর্যায় আসবে যে, বাচ্চাকে যতই মারবেন তাতেও কিছুই কাজ হবে না এবং আর আপনার কথা শুনতেও চাইবে না ● বাচ্চাকে গালি দিলে সে অন্য বাচ্চাদের গালি দিবে এবং তারপর বড়দেরকে, এমনকি মা-বাবাকেও গালি দিতে শুরু করবে ● বাচ্চাকে মারলে সে নিষ্ঠুর হবে এবং প্রতিশোধ নিতে চাইবে। প্রথমে অন্য বাচ্চাদেরকে মারবে, তারপর বড়দেরকেও মারবে ● বাচ্চার সাথে যেরকম ব্যবহার করা হয়, সেও অন্যদের সাথে সেরকম ব্যবহার করবে ● বাচ্চাকে মারলে তার মনের মধ্যে দয়া-মায়া এবং ভালবাসা জন্মায় না। তাকে একটি দয়ালু মন থেকে বঞ্চিত করা হবে। ফলে সে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হবে; কারো সাথে মিশতে পারবে না ও বন্ধুত্ব করতে পারবে না।

এবার দেখা যাক, যখনই আমরা বাচ্চাকে মারতে চাই বা শাস্তি দিতে চাই তখন কী করতে হবে। মা-বাবাকে তাদের মতামত দিতে বলুন। সঠিক উত্তরের জন্য আপনিও তাদেরকে নিচের কথাগুলো বলতে পারেন:

● প্রথমে ভালো করে চিন্তা করে দেখি আসলে বাচ্চা কোনো খারাপ কাজ করছে না কি আমরা অন্য কোনো কারণে রেগে আছি এবং ওকে শাস্তি দিচ্ছি ● খুব আস্তে তবে কড়াভাবে তাকে বলি, সে যে-কাজটা করেছিলো সেটা ঠিক হয় নি অথবা আমি যা ওকে বলেছিলাম সেটাই করা উচিত।

বাচ্চাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যে, মা-বাবার একটু রাগই যেন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি বলে মনে হয়। এটা শুধুমাত্র ভালোবাসা এবং নরম ভাষা দিয়ে করা যায়। নিচের তিনটি আচরণ কার্যকর হতে পারে:

১. তাকে বলেন যে, "আমি তোমার এই কাজের জন্য দু:খ পেয়েছি এবং তোমার সাথে আধা-ঘন্টার জন্য (অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) কথা বলবো না"

২. বাচ্চার সাথে কিছু সময়ের জন্য হাসবেন না

৩. বাচ্চার সাথে কিছু সময়ের জন্য খেলবেন না

কখনও এমন কোনো কথা বলবেন না যা করতে পারবেন না। যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে, বাচ্চাকে শাস্তি দিতে হবে, তাহলে এমন কোনো শাস্তির কথা বলেন যা আপনি অবশ্যই তাকে দিতে পারবেন এবং যা বলবেন তাই করবেন। যেমন যদি তাকে বলেন যে, "আমি তোমাকে নানার বাসায় বা খালার বাসায় নিবো না," তাহলে ওকে কোনো রকমে নিবেন না। কিন্তু এমন কোনো ভয় দেখাবেন না যেটা করতে পারবে না, যেমন আমরা বলি: "এখনই শেয়ালকে ডাকবো, তোমাকে খেয়ে ফেলবে," "তুমি এটা করলে ভুত এসে তোমাকে নিয়ে যাবে," ইত্যাদি।

যদি সে কাজটা আবারও করে, তাহলে যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনি ওর সাথে কথা বলবেন না অথবা খেলবেন না, ঐ সময়টা বাড়িয়ে দিন এবং তাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেন আপনি কেন তার সাথে কথা বলছেন না বা খেলছেন না।

বাচ্চার সাথে ধৈর্য্য সহকারে ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে আচরণ করলে আপনি দেখতে পাবেন তার ফলাফল মার বা গালির চেয়ে অনেক ভালো। আসুন, আমরা এখন থেকে চেষ্টা করি ধৈর্য্যশীল হতে এবং চেষ্টা করি যেন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং কোনো দিন বাচ্চাদের না মারি।

# নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কী এবং কেন

বৃন্দাবন বিশ্বাস, কাজি সেলিম আনোয়ার, মোঃ ফারুক, ফকির আঞ্জুমান আরা

আমাদের দেশে রক্ত পরিসঞ্চালন-সম্পর্কিত দু'টি অতি পরিচিত শ্লোগান হচ্ছে 'রক্তদান-জীবন দান' এবং 'রক্ত দিন-জীবন বাঁচান'। সময়ের ব্যবধানে এ-শ্লোগানগুলোর সংশোধনী প্রয়োজন, কারণ রক্ত শুধু জীবন দানই করে না, জীবন হরণও করে। রক্তের মাধ্যমেই ছড়াতে পারে এইডস, হেপাটাইটিস, সিফিলিসসহ অন্যান্য ঘাতক ব্যাধি। তাই শ্লোগানগুলোতে 'রক্তের' সঙ্গে 'নিরাপদ' শব্দটি যোগ করা জরুরী। সারা পৃথিবীতে এখন নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০০-এর শ্লোগান ছিলো Safe blood starts with me অর্থাৎ আমার থেকেই নিরাপদ রক্তের শুরু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আরো একটি শ্লোগান খুবই সময়োপযোগী: To give blood is a privilege, To receive safe blood is a right অর্থাৎ যিনি রক্ত দেন তাঁর জন্য রক্তদান একটি সুযোগ, নিরাপদ রক্ত গ্রহণ গ্রহীতার জন্য একটি অধিকার। এ থেকে বোঝা যায়, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন বর্তমানে একটি জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখায় প্রধান কয়েকটি আবিষ্কারের মধ্যে রক্ত পরিসঞ্চালন অন্যতম। রক্তের মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে এমন ধারণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রাথমিক পর্যায়ে সেদিকে খেয়াল রাখা হয় নি, কারণ তখন রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য অপরিহার্য সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়োজনই প্রাধান্য পেয়েছিলো বেশি; যেমন রক্তের জমাট বাঁধা (clotting) প্রতিরোধ করা, রক্তকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা, রক্তদাতার রক্তের সাথে গ্রহীতার রক্ত মানানসই কি না তা নিরূপণ করা (cross-matching), ইত্যাদি। পরবর্তী কালে, প্রথম যখন জানা গেলো সিফিলিস ও এইচআইভি রক্তের মাধ্যমে ছড়াতে পারে তখনই কেবল নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ধারণাটা গুরুত্ব পায়। তখন থেকেই এইচআইভি ও সিফিলিসসহ রক্ত পরিসঞ্চালনজনিত অন্যান্য সংক্রমণ প্রতিরোধ করে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়।

নিরাপদ রক্ত বলতে ক্ষতিকর রোগ-জীবাণুমুক্ত এবং পরিসঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত রক্তকে বুঝায়। অন্য কথায়, নিরাপদ রক্ত হচ্ছে সেই রক্ত যা পরিসঞ্চালন করলে রোগ সৃষ্টির কারণ হবে না বা অন্য কোনো ক্ষতি করবে না। নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের উদ্দেশ্য হলো পরিসঞ্চালনজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধ করা, রক্তের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং পরিসঞ্চালনজনিত অন্যান্য জটিলতা প্রতিরোধ করা।

পৃথিবীতে বছরে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ব্যাগ রক্ত পরিসঞ্চালিত হয়; এর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের মত রক্ত কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা (screening) ছাড়াই পরিসঞ্চালিত হয়। আবার অনেক পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নের সম্মুখীন, কারণ একদিকে পরীক্ষকরা যেমন যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, অন্যদিকে তেমনি ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষায় ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যও এজন্য দায়ী। বিশ্বের ৮০ শতাংশ লোক বাস করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে। অথচ মোট নিরাপদ রক্তের মাত্র ২০ শতাংশ

ছবি: স্বাস্থ্য সংলাপ ফাইল

তাদের আয়ত্তে আছে। প্রতিবছর নিরাপদ নয় এমন রক্ত ও ইনজেকশনের মাধ্যমে ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি লোক হেপাটাইটিস বি-তে, ২৩ লক্ষ থেকে ৪৭ লক্ষ লোক হেপাটাইটিস সি-তে এবং ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় আড়াই লক্ষ ব্যাগ রক্ত পরিসঞ্চালিত হয়, যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ আসে পেশাদার রক্তদাতাদের শরীর থেকে, ১৫ শতাংশ আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের শরীর থেকে এবং ২০ শতাংশ আসে পারিবারিক বা বদলি (family/replacement) রক্তদাতাদের শরীর থেকে। পেশাদার রক্তদাতাদের রক্তের মধ্যে ২০.৯৭ শতাংশ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে এবং ১৫.৮ শতাংশ সিফিলিসে দূষিত। স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের মধ্যে এই দূষণের হার যথাক্রমে ৩.৫ শতাংশ এবং ১.০৪ শতাংশ। অন্য এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, পেশাদার রক্তদাতারা ২৯ শতাংশ হেপাটাইটিস বি, ২২ শতাংশ সিফিলিস এবং ৬ শতাংশ হেপাটাইটিস সি-তে আক্রান্ত। যদিও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে রক্তদাতাদের মধ্যে এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তি পাওয়া যায় নি তবুও এটা মেনে নেওয়া কঠিন, কারণ কিছু ব্যতিক্রম বাদে সারাদেশে রক্ত পরিসঞ্চালনের কাজটি এতকাল সম্পন্ন হতো এইচআইভিসহ অন্যান্য রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই। এটি আমাদের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক।

এরকম পরিস্থিতিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরীক্ষীত রক্ত ছাড়া কোনো রক্ত পরিসঞ্চালন করা যাবে না। এ-লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এইচআইভি/এসটিডি প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতায় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচি নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে--যার তত্ত্বাবধানে ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৫৩টি জেলা হাসপাতালসহ সারাদেশে মোট ৯৭টি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে ইতোমধ্যেই রক্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ-প্রকল্পের কার্যকাল নির্ধারিত হয়েছে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এবং এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, সিফিলিস এবং ম্যালেরিয়া--এই পাঁচটি রক্ত পরিসঞ্চালনজনিত রোগের প্রতিরোধ করাই এ-প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া সরকার রক্ত পরিসঞ্চালনকে নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন করতে, রক্তের গুণগত মান ঠিক রাখতে এবং রক্তের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সম্প্রতি 'নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন' নামে একটি আইন প্রণীত হয়েছে।

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে মোটামুটিভাবে তিনটি কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে: (১) কম ঝুঁকিপূর্ণ রক্তদাতা নির্বাচন করে রক্ত সংগ্রহ করা, (২) রক্তের বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং (৩) রক্তের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন নিরাপদ রক্তদাতা বেছে নেওয়া। সেজন্য স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের রক্তই শ্রেয়। তদুপরি রক্ত সংগ্রহের আগে রক্তদাতাদের উপযুক্ততা যাচাইকালে উচ্চ ঝুঁকিপুর্ণ রক্তদাতাদের পরিবর্তে ঝুঁকিহীন বা অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা বাঞ্চনীয়। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রক্তদাতা হচ্ছে: পেশাদার রক্তদাতা, অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারী, মাদকাসক্ত (বিশেষ করে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য ব্যবহারকারী),

৭-এর পাতায় দেখুন...